গীতিকার, চিত্রনাট্যকার প্রসূন যোশীর জন্ম ১৯৭১ সালে উত্তরাখণ্ডের আলমোড়ায়। ভারতীয় চলচ্চিত্রের সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রসূণ যোশীর লেখা ‘ম্যায় অউর ও’ বইটি প্রকাশিত হয় মাত্র ১৭ বছর বয়সেই। পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত প্রসূণ গীতিকার হিসেবে তিনবার সেরা ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ২ বার। বিজ্ঞাপনের কপি রাইটার হিসেবে কেরিয়ার শুরু। কিন্তু গানের প্রতি ঝোঁক ছিল ছোটবেলা থেকেই। মা সুষমা যোশী রাষ্ট্র বিজ্ঞানের প্রফেসর হলেও অল ইন্ডিয়া রেডিওতে তিন দশক সংগীত পরিবেশন করেন।

বুধবার, ৩০ ভাদ্র ১৪২৭ ■ ৪১ বর্ষ ■ ১২০ সংখ্যা

তথ্যহীন সরকার

করোনা মোকাবিলায় গত ২৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার লকডাউন জারি করার পর মোট কত পরিযায়ী শ্রমিক কর্মহীন হয়েছেন বা কতজন মারা গিয়েছেন, তার কোনও তথ্য জানা নেই আমাদের দেশের শ্রমমন্ত্রকের। সোমবার সংসদে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী সন্তোষকুমার গাঙ্গোয়ারের এই বক্তব্য স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো। যে কোনও নীতি বা সরকারি পদক্ষেপ ঠিক করতে তথ্য অন্যতম হাতিয়ার। সেই তথ্য না থাকলে পরিযায়ী শ্রমিকদের কল্যাণে সরকার কীভাবে পদক্ষেপ করবে, তা নিয়ে সংগত প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। এই অজ্ঞানতা পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্যও বটে। শত সমালোচনা সত্ত্বেও পরিযায়ী শ্রমিকদের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যে গত মার্চ মাস থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার নীতির পরিবর্তন করেনি, শ্রমমন্ত্রীর বক্তব্যে সেটা পরিষ্কার। কাউকে কিছু আগাম না জানিয়ে হঠাৎ লকডাউনে যে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পরিযায়ী শ্রমিকদের চরম দুর্দশার সম্মুখীন হতে হবে, সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের অজানা ছিল না। পরিযায়ী শ্রমিকদের সিংহভাগ অসংগঠিত ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত। কেন্দ্রীয় সরকার জানত, রুজিরুটি ও আয়ের বিকল্প ব্যবস্থা না করে সবকিছু রাতারাতি স্তব্ধ করে দিলে অসংগঠিত ক্ষেত্র সর্বাধিক ক্ষতির মুখে পড়বে। কেন্দ্র জানত, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড থেকে যে সমস্ত মানুষ দলে দলে সামান্য কিছু রোজগারের আশায় মুম্বই, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, আহমেদাবাদের মতো বড় শহরগুলিতে এসে দিনরাত পরিশ্রম করেন, হঠাৎ সবকিছু বন্ধ হয়ে গেলে তাঁরা প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। তাঁদের জীবন ও জীবিকা চূড়ান্ত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পড়বে। বাস্তবে তাই ঘটেছে।

লকডাউনের সময় লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক স্ত্রী–সন্তানের হাত ধরে যেভাবে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে কিংবা সাইকেল চেপে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে একমাত্র দেশভাগ পরবর্তী শরণার্থী স্রোতের তুলনা চলে। নিরন্ন, তৃষ্ণার্ত অবস্থায়, খালি পায়ে এতগুলি মানুষ দিনের পর দিন হাঁটছে দেখেও কেন্দ্রীয় সরকার গোড়ার দিকে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। অর্থনীতিবিদরা পরিযায়ীদের হাতে নগদ অর্থদানের দাবি জানানো সত্ত্বেও কেন্দ্র নির্বিকার ছিল। চাপে পড়ে শেষমেশ শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালিয়ে কেন্দ্র কৃতিত্ব জাহির করলেও ট্রেনগুলিতেও চোখে পড়েছিল চূড়ান্ত অব্যবস্থা। এখন কেন্দ্র দাবি করছে, তাদের কাছে কোনও তথ্য নেই। মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে রেললাইন ধরে হাঁটতে থাকা ক্লান্ত শ্রমিকদের দেহ মালগাড়ির চাকায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া কিংবা সাইকেলে চেপে জাতীয় সড়ক বরাবর চলতে চলতে নিত্যদিন দুর্ঘটনায় পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যু কিংবা প্রচণ্ড গরমে খিদে, তেষ্টায় শ্রমিক স্টেশনের শৌচাগারে কিংবা রেলস্টেশনে তাঁদের মৃত্যু, রুজিরুটির টানে জেরবার মানুষগুলির আত্মহত্যা এখনও দেশ ভুলতে পারেনি। অথচ কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের দাবি, আগামী নভেম্বর পর্যন্ত ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে র‍্যাশন দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। গরিব কল্যাণ যোজনায় একাধিক পদক্ষেপও করা হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য। ভাবখানা এমন যেন, দু'মুঠো চাল আর ডাল দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি দয়া দেখাচ্ছে।

চিকিৎসক যদি রোগ ধরতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাঁর কাছে চিকিৎসা পাওয়ার আশা অলীক কল্পনা হয়ে দাঁড়ায়। কোনও আগাম নোটিশ ছাড়া হঠাৎ সবাইকে চমকে দেওয়ার মতো একাধিক সিদ্ধান্ত গত ৬ বছরে একাধিকবার নিয়েছে মোদি সরকার। করোনার মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের লকডাউনের সিদ্ধান্ত আদৌ যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ ছিল কি না সে তর্কের সময় এখন নয় ঠিকই। তবে তাতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ যে বিন্দুমাত্র দমানো যায়নি, সেটা এতদিনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। আর সেই সঙ্গে দেশের মৃতপ্রায় অর্থনীতির শরীরে লকডাউন নামক খাঁড়ার কোপ যে মারাত্মক আঘাত হেনেছে, তাতে পরিস্থিতি আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। লকডাউনের ফলে যাঁরা সব থেকে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেই পরিযায়ী শ্রমিকদের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যে বিন্দুমাত্র সহানুভূতিশীল নয়, সেটা শ্রমমন্ত্রকের জবাব থেকেই স্পষ্ট। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যখনই অভিযোগের আঙুল উঠেছে, তখনই সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে কেন্দ্র জানিয়েছে, তারা গত ৬ বছর ধরে যা কিছু করেছে, সব গরিবদের স্বার্থে। অথচ জীবন ও জীবিকার চক্করে গরিব, সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠলেও কেন্দ্রের তরফে শুধু শুকনো প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসের বন্যা ছাড়া আর কিছু জোটে না। ভারতকে আত্মনির্ভর করে তোলার চাবিকাঠি রয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকদের হাতেই। তাঁদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, অসম্মানিত করে, হিসেবের বাইরে রেখে মোদি সরকার যতই চেষ্টা করুক, তাতে আত্মনির্ভর ভারত গঠনের স্বপ্ন সফল হওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

অমৃতধারা

যারা বাত, পিত্ত ও কফ–এই ত্রিধাতু পরিপূরিত জড় দেহটাকে আত্মা বলে মনে করে, নিজের ভার্যা, পুত্র কন্যাদিকে নিজের বলে মনে করে, যে ভূমিতে এ দেহ জন্ম হয়েছে, তাকে পূজ্য বলে মনে করে এবং জলেতে তীর্থ বুদ্ধি করে, তারা অবৈষ্ণব কিন্তু যাঁরা অনাসক্ত হয়ে কৃষ্ণ সুখের অনুকূল যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করেন এবং বিষয়েতে নিজের ভোগ বুদ্ধি ত্যাগ করে কৃষ্ণ সম্বন্ধে সম্বন্ধ বিশিষ্ট করে বিষয়কে কৃষ্ণ সেবাতে লাগান তাঁরাই বৈষ্ণব। তাঁরা জানেন যে সব বস্তু হরি সম্বন্ধী এবং সব কৃষ্ণ সেবার উপকরণ। তাই তাঁরা কোনওটাই ত্যাগ করার উপদেশ দেন না, বরং কীরূপে সবই কৃষ্ণের সেবাতে বিনিযুক্ত করতে হয়, তা জনসমাজকে শিক্ষা দেন। এ হচ্ছে বৈষ্ণব দর্শন।

বৈষ্ণব দর্শন অপার ও অনন্ত এবং অত্যন্ত গভীর। সাধারণ মানুষ এ তত্ত্বের মধ্যে সহজে প্রবেশ করতে পারবে না। এর মধ্যে প্রবেশ করতে হলে সৎগুরুর পাদাশ্রয় করে তাঁর আনুগত্যে নাম ভজন করতে হবে।

–ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শব্দরঙ্গ ■ ২৭১৫

পাশাপাশি : ২। ঋষি গৌতমের পুত্র ৫। আদালতের উচ্চপদস্থ কেরানিবিশেষ ৬। জন সাধারণের অধিদেবতা, গণদেবতা ৮। দার–এর চলিত বাংলা রূপ ৯। ছোট নল, কণ্ঠনালি, ছোট নলের মতো সরু হাড় বা অঙ্গ ১১। শিব ১৩। পূর্ণচন্দ্র, পিরবিশেষ, কুল গাছ বা কুল ফল ১৪। জেলখানা।

উপর–নীচ : ১। পান ভোজন , আহারাদি ২। মানুষ, পুরুষ মানুষ, ঋষিবিশেষ ৩। পতাকা, নিশান ৪। উধাও, অদৃশ্য ৬। বার্ধক্য, স্থবিরতা ৭। বিখ্যাত তীর্থস্থান গয়ার পান্ডা ৮। পুত্র, বালক ৯। নাকের একপাশে পরবার গয়নাবিশেষ ১০। পদ্মফুল, তামা, সোনা বা বারো অক্ষরযুক্ত সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ ১১। পালন, আমল দেওয়া, দক্ষিণ ভারতের ভাষাবিশেষ ১২। ছোট ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ১৩। বিয়ের পাত্রপাত্রীর একজন, আশীর্বাদ, দেবতার কাছ থেকে লব্ধ অনুগ্রহ।

সমাধান ■ ২৭১৪

পাশাপাশি : ১। দমসম ৩। কটক ৫। উপক্রমণিকা ৬। বরদ ৭। তুহিন ৯। উত্তরপুরুষ ১২। সজনি ১৩। মতামত।

উপর–নীচ : ১। দবদব ২। মধুপ ৩। কদম ৪। করকা ৫। উদ ৭। তুষ ৮। নতোন্নত ৯। উচ্ছ্বাস ১০। রজনি ১১। রুসুম।

মহালয়ার জাতকের জাদুপ্রীতি

দীপক রায়চৌধুরী
জাদুকর ও লেখক

শ্রদ্ধা–স্মরণ

ক্রমশ প্রণবদার বাড়িটি হয়ে উঠেছিল জাদুচর্চার একটি প্রাণকেন্দ্র। বাংলার জাদুকরদের নিয়মিত আনাগোনা ছিল তাঁর বাড়িতে। কে আসত না সেখানে? জাদুকর সমীরণ, গৌতম গুহ, সুনীপ সাহা, রাজ কোঠারি, ডি লাল, অমর সেন, সব্যসাচী সেন, প্রিন্স শীল, বিক্রমাদিত্য, এম এন মুখার্জি, ম্যাজিকপ্রিন্স এস লাল, রাজকুমার, দীপক রায়, সুনীল কর্মকার, তাপস বসু, সূরজ, তরুণতম অ্যামেজিং ডেভিড– কে নয়!

সালটা ১৯৭৮। কলকাতা থেকে একদল জাদুকর চলেছেন জব্বলপুর। উদ্দেশ্য জাদুকর রমেশ ও আনন্দ আয়োজিত জাদু সম্মেলনে অংশগ্রহণ। দলে রয়েছেন জাদুকর ফ্র্যাংক (দীপ্তেন বিশ্বাস), পিটার প্যান, শৈলেশ্বর প্রমুখ জাদুকর এবং বিখ্যাত জাদু সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক শংকর দাস। আর মধ্যমণি হিসেবে রয়েছেন কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়। উনি যাচ্ছেন জাদু প্রতিযোগিতার অন্যতম আমন্ত্রিত বিচারক হয়ে। ইতিমধ্যে প্রণবদা বাংলার একজন গণ্যমান্য জাদু সমালোচক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। জাদুপ্রীতি তাঁকে বাধ্য করেছিল জাদু–সাহিত্যে মনোনিবেশ করতে এবং গভীরভাবে তা নিয়ে পড়াশোনা করতে। প্রণবদা নিজে একসময় নানারকম তাসের ম্যাজিক দেখাতেন। অঙ্কের ধাঁধার মতো যেসব ম্যাজিক, তা ওঁর খুবই পছন্দের ছিল। খুব বলতেন প্রবাদপ্রতিম আমেরিকান ম্যাজিশিয়ান জন স্কার্নের কথা। ওঁর জাদু সংক্রান্ত বইয়ের সংগ্রহও ছিল ঈর্ষণীয়।

ক্রমশ প্রণবদার বাড়িটি হয়ে উঠেছিল জাদুচর্চার একটি প্রাণকেন্দ্র। বাংলার জাদুকরদের নিয়মিত আনাগোনা ছিল তাঁর বাড়িতে। কে আসত না সেখানে? জাদুকর সমীরণ, গৌতম গুহ, সুনীপ সাহা, রাজ কোঠারি, ডি লাল, অমর সেন, সব্যসাচী সেন, প্রিন্স শীল, বিক্রমাদিত্য, এম এন মুখার্জি, ম্যাজিকপ্রিন্স এস লাল, রাজকুমার, দীপক রায়, সুনীল কর্মকার, তাপস বসু, সূরজ, তরুণতম অ্যামেজিং ডেভিড– কে নয়! আমি নিজেও তো কোনও নতুন ম্যাজিক তৈরি করলে মনে মনে ভাবতাম, কবে প্রণবদাকে গিয়ে সেটা দেখিয়ে আসব! আসলে ম্যাজিকের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রত্যেক মানুষকেই প্রণবদা নিজের আত্মজন বলে মনে করতেন। তাঁদের সুখ–দুঃখের খবর নিতেন। কারও খোঁজ একটু বেশিদিন না পাওয়া গেলে, আমাদের মতো যাদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল, তাদের কাছে তার খবর জিজ্ঞেস করতেন। তবে, প্রণবদার অত্যন্ত প্রিয় জাদুকর, যাদের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ, তাঁদের মধ্যে জাদুকর রাজ কোঠারি আর ডি লাল সবার আগে। রাজ কোঠারির হাতের ‘কয়েন থ্রু টেবিল’ (একটি ধাতুর মুদ্রা, কাঠের টেবিল ভেদ করে নীচে পড়ে যাচ্ছে) আর ডি লালের হাতের ‘কাপস অ্যান্ড বলস’ (তিনটি ধাতব কাপের মধ্যে এক বা একাধিক বল স্থান পরিবর্তন করছে, কখনও ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে) প্রণবদার বর্ণনায় আমাদের কাছে মূর্ত হয়ে উঠত। পরের দিকে খুব প্রিয় ছিল জাদুকর সুনীল কর্মকারের হাতসাফাই এবং তাসের খেলা।

প্রণবদা তাঁর প্রিয় কবি–লেখকদের নিয়ে যখন আড্ডার আসর বসাতেন, তখন তাতে অনিবার্যভাবে ম্যাজিকও থাকত। আর থাকত খাওয়াদাওয়া। আন্দাজ, বছর দুয়েক আগে ম্যাজিশিয়ান সুনীল কর্মকার যেদিন প্রণবদার বাড়িতে ম্যাজিক দেখাল, সেদিনও নয় নয় করে ওঁর জনা বিশ–পঁচিশজন আত্মীয়–বন্ধু তো এসেই ছিলেন। ম্যাজিক শেষে সবার জন্যে ছিল মিষ্টি আর তাঁর পুত্রবৎ–বন্ধু, যে তাঁকে সর্বক্ষণ আগলে রাখত, সেই সুব্রত গুহ'র হাতের কাতলামাছের অপূর্ব চপ। মনে আছে, আরেকবার বর্ষায় ওঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল ইলিশ মাছ আর খিচুড়ি খাওয়ার। সেদিন আমার আর সুনীল কর্মকারের সঙ্গে নিমন্ত্রিত ছিল স্নেহভাজন কবি রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ক্লোজ–আপ ম্যাজিকের আসর শেষ হলে, সুব্রতর হাতের দারুণ খিচুড়ির সঙ্গে তিন–চার পিস করে গরম গরম ইলিশ মাছ ভাজা খাইয়েও প্রণবদার যেন আশ মিটছিল না। বারবার দুঃখ করছিলেন, যোধপুর পার্ক বাজারে চেনা মাছ বিক্রেতা নিমাইয়ের কাছে আরও একটু বড় মাপের ইলিশ পাওয়া যায়নি বলে। অমন খাদ্যরসিক মানুষ তো বড় একটা দেখি না। একবার ওঁর বাড়িতে খিচুড়ি দিয়ে পাঁঠার মাংস খাচ্ছি। আর উনি পাশে বসে খেতে খেতে আমায় বলছেন, ‘আহ, দীপক! মাংসের ঝোলটা একটু খিচুড়ির মধ্যে মেখে খাও! তবে তো স্বাদ পাবে!’

কতবার যে ওঁর বাড়িতে খেয়েছি তার কোনও হিসেব নেই। মোটামুটি আটের দশকের শুরুর দিকে প্রণবদা এই খাওয়াদাওয়া নিয়ে আমাদের একটা গ্রুপ তৈরি করেছিলেন। এতে ছিলেন প্রণবদা নিজে, ওঁর বোন খুকুদি, ওঁর এক ভায়রাভাই কেষ্টদা, জাদুকরদের মধ্যে সুনীপদা, তাপস আর আমি। সেই গ্রুপে ঠিক হয়েছিল এক–একবার এক–একজনের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে সবাইকে সপরিবার খাওয়াতে হবে। এখন তার জন্য তো একটা উপলক্ষ্য চাই। উপলক্ষ্য কী– না, যে যার বিবাহবার্ষিকীতে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। এবং শুধু তাই না, আমাদের মধ্যে একমাত্র সুনীপদা, যে বিয়ে করেনি, তাকে প্রণবদা বলেছিলেন, ‘তাহলে তোমার জন্মদিন হোক অথবা তোমার খুশিমতো একটা উপলক্ষ্য তুমি বানিয়ে নাও! কিন্তু আমাদের নেমন্তন্ন করতেই হবে। পালালে চলবে না।’

এই একটা ব্যাপার ছিল দারুণ ইন্টারেস্টিং। সবাই মিলে হইহই করতে করতে সবার বাড়ি যাওয়াটাওয়া হত। আমার মনে আছে প্রণবদার মেয়ে টুপুর, শ্রাবণী বউদি, তাপসের ছেলে–মেয়ে–বউ, আমার ছেলে–মেয়ে–গিন্নি আর সুনীপদা মিলে সাতাশি–অষ্টাশি সাল নাগাদ বেড়াতে গিয়েছিলাম সাগরদ্বীপে। সেখানে যে হোটেলটা আমরা বুক করেছিলাম দেখলাম সেখানে জল নেই। পাম্প খারাপ হয়ে পড়ে আছে। তখন প্রণবদা বললেন, ‘বকখালিতে চলো।’ সেখান থেকে আমরা আবার ছুটলাম বকখালি। সব মিলিয়ে কিন্তু খুব মজা হয়েছিল।

প্রণবদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল একদম পারিবারিক। আমার ছেলে যখন মাত্র সাত বছর বয়সে চলে গেল ১৯৮৯ সালে, তখন প্রণবদা খুব আঘাত পেয়েছিলেন। এরপরে আচমকা চলে গেল ওঁর মেয়ে টুপুর। সেই ধাক্কাটাও ছিল সহ্যের বাইরে। ওই একই ধরনের দুটো ধাক্কা বোধহয় অবচেতনে আমাদের আরও কাছাকাছি এনে দাঁড় করিয়েছিল। এর কিছুদিন পরে তো বউদিও চলে গেলেন। প্রণবদা হয়ে গিয়েছিলেন নিঃসঙ্গ এবং একা। নানা বৃত্তের বন্ধুদের তখন উনি যেন আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরতে চাইতেন আত্মীয়–স্নেহে।

একসময় প্রণবদা ‘দেশ’ পত্রিকায় বিভিন্ন জাদুর অনুষ্ঠানের সমালোচনা লিখতেন। সেসময় আর কেউ সেটা করতেন বলে আমার মনে পড়ে না। পরেও দেখেছি বলে তেমন স্মৃতি নেই। জাদু যে একটি উন্নতমানের শিল্প এবং জাদুর অনুষ্ঠানের সমালোচনাও যে গান, নাটক বা সাহিত্য অনুষ্ঠানের মতোই একটি মান্য সাহিত্য পত্রিকায় এসবের পাশাপাশি স্থান পাওয়ার যোগ্য– এটা প্রণবদা তাঁর জাদুপ্রীতির কারণেই প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। এই সময় থেকেই উনি শুরু করেন জাদু বিষয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালিখি। দীপক রায় সম্পাদিত ‘জাদুকর’ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন তিনি। অনেক আগে ‘বুদ্ধির্যস্য’ নামে একটি অসাধারণ ধাঁধার বই লিখেছিলেন, যা এখন দুষ্প্রাপ্য। আনন্দমেলা ও তথ্যকেন্দ্র পত্রিকার ‘সত্যসন্ধ’ ও ‘মজারু’ যে আমাদেরই প্রিয় প্রণবদা, তা আজ অনেকেরই জানা।

‘একদিন’ পত্রিকার শারদসংখ্যা ‘নবপত্রিকা’ ২০১০–এ ওঁর দেখা জাদুকরদের নিয়ে একটি অসাধারণ রচনা লিখেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন, ‘ম্যাজিক! ম্যাজিক!’ পরে ওই পত্রিকাতেই ২০১২ সালের শারদীয়া সংখ্যায় লিখেছিলেন আরেকটি জরুরি লেখা ‘বাঙালির সার্কাস’। ফেব্রুয়ারি ২০১৭–তে ‘লিপিনাগরিক’ পত্রিকার সংগ্রাহক সংখ্যায় প্রণবদা লিখেছিলেন তিন জাদু সংগ্রাহককে নিয়ে : পূর্ণচন্দ্র মেহরা (পি সি মেহরা), বিশ্বেশ্বর দাস (বি দাস) এবং শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে প্রথম দুজনের সম্পর্কে নানা তথ্য এবং ছবি জোগাড় করতে ওঁকে ওই বয়সেও কী পরিমাণ সক্রিয় হতে হয়েছিল, তার সাক্ষী আমি নিজে। এর মধ্যে পুরুলিয়ার বি দাসকে আমি নিজেও চোখে দেখিনি। কিন্তু সেই মানুষটির কৃতিত্বকে সবার চোখের সামনে তুলে ধরার জন্যে তাঁর যে প্রচেষ্টা, তা ছিল তুলনাহীন। একটি তথ্য, তা যত তুচ্ছই হোক না কেন, তাকে পুরোপুরি যাচাই না করে লিখে দেওয়ার কোনও নজির আর যারই থাক না কেন, প্রণবদার অন্তত ছিল না।

জাদুজগৎ বিভিন্নভাবে তাঁর অবদান ভুলবে না। তাপস বসুকে আনন্দমেলায় আর ম্যাজিক প্রিন্স এস লাল–কে তথ্যকেন্দ্র পত্রিকায় নিয়মিত ম্যাজিক শেখানোর জন্য উনিই যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন।

আজও প্রিন্স শীল তাঁর বিখ্যাত ‘বুলেট ক্যাচিং’ (বন্দুকের বুলেটের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে নিজের দাঁতে করে কামড়ে ধরা) ম্যাজিকটির জনপ্রিয়তার জন্য প্রণবদার ভূমিকার কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেন।

প্রণবদার কাছে আমারও ঋণের শেষ নেই। জাদুর সঙ্গে আমার একটু–আধটু গল্প লেখার বদভ্যাস আছে। সেগুলো নানান পত্রপত্রিকায় বেরোলেও সেগুলি নিয়ে বই করার কোনও পরিকল্পনাই আমার ছিল না। এটা ঘটেছিল আমার নিজেরই ছোটভাইয়ের উৎসাহে। ঠিক হয়েছিল, একই মলাটে প্রকাশ হবে দুটি গল্পের বই– দাগ, ডবল পেমেন্ট। বইটির একটি ভূমিকা লিখে দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে আমি প্রণবদার কাছে গিয়েছিলাম খুবই কুণ্ঠিতভাবে। উনি আনন্দের সঙ্গে তা লিখে দিয়েছিলেন। আমাকে যে উনি কতটা ভালোবাসতেন তার নমুনা ধরা রয়েছে ওই অসামান্য ভূমিকায়। তারপর ২০১৬–র ১৩ অগাস্ট প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে আমাদের ছোট্ট অনুষ্ঠানটিতে এসে ওই বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশও করেছিলেন নিজের হাতে। আর যা বক্তব্য রেখেছিলেন, তাতে একজন জাদুকরের গল্পের বই বেরিয়েছে– এটা তাঁর কাছে যে খুবই আনন্দের একটা ব্যাপার, সেটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল।

‘ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ম্যাজিক অ্যাসোসিয়েটস’ (ফিমা)–এর জন্মলগ্ন থেকে প্রণবদা অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে এসেছেন। তাঁকে ছাড়া ফিমা'র ‘ম্যাজিক মেলা’ ভাবাই যায় না। মনে আছে, ম্যাজিক মেলা দুপুর দুটোয় শুরু হত বলে, উনি দুপুরের রোদ উপেক্ষা করে রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে হাজির হয়ে যেতেন, সেই সময় খোলামাঠে মাদারিদের খেলা চাক্ষুষ উপভোগ করার জন্য।

জাদু সমালোচনায় তিনি অত্যন্ত নিরপেক্ষ ছিলেন। প্রয়োজনে রূঢ়ভাবে সমালোচনা করতেও দ্বিধা করতেন না। সব জাদুকরের হাতে একই ধরনের ম্যাজিক দেখে দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি ‘জাদুকর’ পত্রিকার পাতায় লিখেছিলেন, ‘কেন তোমাদের একজনের খেলা দেখলেই সবার খেলা দেখা হয়ে গেল বলে আমাদের মনে হয়?’

এই মোক্ষম প্রশ্নটিই যেন বাংলার জাদুকরদের উদ্দেশে প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়–এর শেষ সতর্কবাণী।

প্রণবদার এই লাস্ট ওয়ার্নিং যদি আজকের জাদুকররা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে ও কাজে লাগায়, তা হলে বাংলার জাদু অভিনবত্বে ও বৈচিত্র্যে নিশ্চয়ই আবার শ্রেষ্ঠত্বের আসন অর্জন করবে।

কবি, সমালোচক, সংগীতজ্ঞ, ধাঁধা–ম্যাজিক প্রিয়, ব্লার্ব লেখক এবং দুঁদে সরকারি আধিকারিক– বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মানুষটি জন্মেছিলেন মহালয়ার দিনে। মহালয়ার জাতকের প্রতি রইল অফুরান শ্রদ্ধা।

ঋণ : সৈকত মুখোপাধ্যায়

সব জাদুকরের হাতে একই ধরনের ম্যাজিক দেখে দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি ‘জাদুকর’ পত্রিকার পাতায় লিখেছিলেন, ‘কেন তোমাদের একজনের খেলা দেখলেই সবার খেলা দেখা হয়ে গেল বলে আমাদের মনে হয়?’ এই মোক্ষম প্রশ্নটিই যেন বাংলার জাদুকরদের উদ্দেশে প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়–এর শেষ সতর্কবাণী। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মানুষটি জন্মেছিলেন মহালয়ার দিনে। মহালয়ার জাতকের প্রতি রইল অফুরান শ্রদ্ধা।

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

শারীরিক দূরত্ব

লকডাউনে যে শব্দটি বারবার ঘোরাফেরা করছে, সেটা হল সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। প্রশ্ন হল, কথাটা কতটা ঠিক? বরং শারীরিক দূরত্ব ঠিক আছে। বর্তমান পরিবেশে সামাজিক দূরত্ব কী করে বজায় রাখা রাখা সম্ভব? মিডিয়ার কাছে অনুরোধ, সামাজিক দূরত্বের সতর্কবার্তা এবার বন্ধ হওয়া দরকার। করোনাকে যখন সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে, তখন শুধু শারীরিক দূরত্ব থাকুক, অন্য কিছু নয়।

তরুণতপন মুখার্জি
হ্যামিল্টনগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার।

হাতে লেখা আমন্ত্রণপত্র ফিরে আসুক

করোনার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে সব অনুষ্ঠান করতে হচ্ছে। নিমন্ত্রণপত্র প্রেস থেকে ছাপানো যাচ্ছে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে হাতে লিখে কাজ সারতে হচ্ছে। প্রযুক্তির দাপটে হাতে লেখা তো উঠেই গিয়েছিল। অনেকদিন হল বিজয়ায় চিঠি লেখাও বন্ধ। তাতে কিন্তু অনেক আন্তরিকতার ছোঁয়া থাকত। নিমন্ত্রণপত্র নিজে হাতে লেখা অত্যন্ত আনন্দের এবং আন্তরিকতাপূর্ণ। আগে হাতে লেখা চিঠিতেই নিমন্ত্রণ করতে হত। এখন বিলাসিতা আন্তরিকতাকে খেয়ে ফেলেছে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে বিয়ে থেকে শুরু করে অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য নিমন্ত্রণপত্র হাতে লিখতে হচ্ছে। এতে হাতের লেখার অভ্যাস যেমন হচ্ছে, আরেকদিকে বাংলা ভাষারও চর্চা হচ্ছে। হাতে লেখা আমন্ত্রণপত্র চিরদিন চালু থাকুক এবং হাতে লেখা চিঠির আদানপ্রদান হোক। তাহলে হাতের লেখা ও মধুর ভাষা অটুট থাকবে আশা করা যায়।

তিমির ব্যানার্জি
হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি।

বঞ্চিত ভাটাখানা

কয়েক দশক ধরে জলপাইগুড়ির রবীন্দ্রনগরের ভাটাখানা রাস্তাঘাট, ড্রেন থেকে শুরু করে পানীয় জল, পথবাতি সহ যাবতীয় সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফলে বাসিন্দাদের খুবই সমস্যা হচ্ছে। এক সময় এখানে বিশালাকার ইটভাটা ছিল, বর্তমানে তা নেই। অত্যন্ত নীচু এলাকা হওয়ায় এখনও প্রত্যেক বছর ভারী বৃষ্টিতে এখানে বন্যা হয়। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে বন্যার স্রোত বয়ে চলে। কারও বাড়িতে হাঁটুজল, কারও বা কোমরসমান জল থাকে। এলাকায় একটি হাইস্কুলও রয়েছে। স্কুলে প্রবেশের রাস্তাতেও ড্রেনের জল থাকে। দূরদূরান্ত থেকে অনেক চাকরিপ্রার্থী এই স্কুলে পরীক্ষা দিতে আসেন। কিন্তু রাস্তাঘাটের সমস্যায় তাঁদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

এদিকে, জলপাইগুড়ি পুরসভার বাকি ২৪টা ওয়ার্ড দেখলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ২ নম্বর ওয়ার্ড তথা রবীন্দ্রনগর ভাটাখানা অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। অতএব, ভাটাখানার মানুষজন যাতে যাবতীয় সুবিধা পান, সেজন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

চন্দ্র দেবনাথ
রবীন্দ্রনগর ভাটাখানা, জলপাইগুড়ি।

বেহাল পরিবহণ

জলপাইগুড়ির পরিবহণ ব্যবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে। সরকারি, বেসরকারি কোনও বাসই সময়মতো চলে না। ফলে যাত্রী দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। ডিপো থেকে বলা হয়েছে, সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ৭টা পর্যন্ত সরকারি বাস চলবে। কিন্তু কোথায় সেই ব্যবস্থা? সকাল ৮টা ৩০ মিনিটের আগে কোনও বাস চলে না। বেসরকারি বাস, মিনিবাসের একই হাল। যাও বা চলছে তাও ভিড়ে ঠাসা। সামাজিক দূরত্বও মানা হচ্ছে না। এরকম চললে যাত্রী দুর্ভোগ বাড়বে বই কমবে না।

সুব্রত খাসনবিশ, ফাটাপুকুর,
স্কুলপাড়া, জলপাইগুড়ি।

কারও হুঁশ নেই

সিবিআই লেগেছে পিছনে। টিভি চ্যানেলে দিনরাত এক খবর অবিরাম চলছে। ভারতে আর যেন কোনও খবরই নেই। দেশের অর্থনীতি তলানিতে ঠেকেছে। তাতে কারও হুঁশ নেই। রাজস্ব আদায়ে বড়ই সিদ্ধহস্ত। কোভিড–১৯'এর জন্য রাজনৈতিক দলের কোনও কাজ আটকে নেই। অথচ সাধারণ মানুষের জন্য সব বাধ্যবাধকতা। এটা না, ওটা না, সবেতেই না। কাজকর্ম লাটে উঠেছে। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের অসহায় অবস্থার জন্য তাঁদের কি কোনও দায় নেই? মুখে শুধু ভাষণ আর ভাষণ। এই ফ্রি, ওই ফ্রি! সন্ধ্যা হলেই টিভিতে মাইকের সামনে।

নূপুর রায়
লেকটাউন, শিলিগুড়ি।

ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবি

আমি অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী রিটায়ারমেন্টের টাকা দিয়ে ইসলামপুর শহরের সন্নিকটে জমি কিনে ছোট চা বাগান তৈরি করেছিলাম। ইসলামপুর বাইপাস তৈরি করার জন্য আমার চা বাগানের প্রায় তিন একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এতে আমার বাকি বাগানটুকু নষ্ট হয়ে গেল। তাতেও আমি জাতীয় স্বার্থে জমি দিতে আপত্তি করিনি। শুধু বাজারমূল্য হিসাবে ন্যায্য ও উচিত ক্ষতিপূরণ চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ তো দেয়ইনি, উপরন্তু ধার্য করা ক্ষতিপূরণের বহু টাকা আত্মসাৎ করে নিয়েছে। সরকারি অফিসার ও নেতা–মন্ত্রীদের কাছ থেকে অনেক অত্যাচার ও লাঞ্ছনা পেয়েছি। মহকুমা ও পুরসভা শহরের নিকটবর্তী জমির দর দিয়েছে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা প্রতি একর। আবার এই টাকার পেমেন্ট দিয়েছে ভাগে ভাগে ২০১০–২০১৮ সালের মধ্যে। এখনও অনেক টাকা বাকি আছে। এখানে জমি অধিগ্রহণ আইন অমান্য করা হয়েছে। একই রকমভাবে এখানে প্রায় ৩,০০০ জমিহারা কৃষক লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হয়েছেন। সরকারের উচিত, সমস্যার সমাধান করে জমিহারা কৃষকদের উপকার করা।

শংকরচন্দ্র ভাওয়াল
স্কুলপাড়া, চোপড়াঝাড়, ইসলামপুর।

অগ্নিমূল্য

সর্বত্র সবজির বাজার অগ্নিমূল্য। কোন জিনিসের দাম কী হবে, তা ঠিক কোন পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হবে ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকেরও নিয়ম থাকার কথা। না হলে লাগামছাড়াভাবে অতিলোভী একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কারবার জনগণের নাভিশ্বাসের কারণ হয়ে উঠেছে। সব কিছুর মধ্যে অবশ্যই একটা সীমা থাকা দরকার। সবজির বাজারে তার দেখা মেলা ভার।

দেবাশিস গোপ
কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।